রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু-ভাবনার ব্যতিক্রমী বিশ্লেষক : সুকুমারী ভট্টাচার্য

সুরঞ্জনা জানা

অনুচিন্তন

সুকুমারী ভট্টাচার্যের অন্তরাত্মায় যেমন লালিত ছিল ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি ও জীবনবোধের অনন্য স্বরূপ, তেমনি রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির বিচিত্রভূবন তাঁর মানসলোকে নানাভাবে প্রাণিত করেছে। সেই বিচিত্র ভাবনার একটি অন্যতম দিক রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু ভাবনা। রবীন্দ্রনাথের জীবনবৃত্ত ও কাব্য-বিবর্তনের নানা স্তরে কীভাবে মৃত্যুচেতনার প্রতিবিম্বন ঘটেছে, তাকে তিনি স্বতন্ত্রদৃষ্টিকোণ থেকে যুক্তিসিদ্ধ ও তথ্যনিষ্ঠ করে আলোচনা করেছেন। বর্তমান আলোচনায় প্রাবন্ধিকের অনুধ্যান দৃষ্টিতে কীভাবে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুভাবনা ধরা পড়েছে, সেটাই তুলে ধরা আমাদের অভিপ্রায়।

সূচক শব্দ: মনোহারী স্বরূপ, ফিরতি পথ, তমশাচ্ছন্ন, প্রলয়ংকারী, অট্টহাস্য, সর্বধ্বংসী, চেতনসত্তা, নবজীবন, প্রবেশদ্বার, অভিঘাত, অমৃতত্ব, উতরোল, মহাজাগতিক, সংকল্পনা।

১

'গাঙচিল' প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত সুকুমারী ভট্টাচার্যের 'প্রবন্ধ সংগ্রহ ৩'-এ রবীন্দ্র প্রসঙ্গ শিরোনামে প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথের উপর বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ রয়েছে। সেগুলির বিন্যাসক্রম যথাক্রমে, 'অমৃতের পথে: রবীন্দ্রকাব্যে মৃত্যু-প্রসঙ্গ', 'রবীন্দ্রকাব্যে মানুষ ও নৈতিকতা', 'রবীন্দ্রসাহিত্যে সংস্কৃত প্রভাব', 'রবীন্দ্র সাহিত্যে সংস্কৃত নাকট'। রবীন্দ্রনাথের জীবনের পাশাপাশি তাঁর কাব্যে মৃত্যুচেতনা, মানুষের নৈতিকতা, তাঁর সাহিত্যের বিচিত্রভূবনে সংস্কৃতের প্রভাব আলোচিত হয়েছে এই প্রবন্ধগুলোতে। এই প্রবন্ধসংকলনের 'ভূমিকা'য় এ প্রসঙ্গে সুকুমারী ভট্টাচার্য বলেছেন:

> ''জীবনের সন্ধানে আমাদের যে অনুশীলন তার প্রতি ছত্রে, প্রতি অক্ষরে রবীন্দ্রনাথ; তাঁর বহুধা-পরিব্যাপ্ত সত্তা নিয়ে আমাদের অনন্ত পরিক্রমা। এই চলমানতায় সামান্য কিছু যোগ হল, 'রবীন্দ্র প্রসঙ্গ'-তে, তাঁর কাব্যে মৃত্যু, মানুষ ও নৈতিকতা, সংস্কৃত প্রভাব ও তাঁর নাটক সম্বন্ধে কিছু আলোচনায়।''[১]

'অমৃতের পথে:রবীন্দ্রকাব্যে মৃত্যু প্রসঙ্গ' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক রবীন্দ্র-কাব্য ধারার বিবর্তনের রবীন্দ্র-দর্শনের দিক থেকে মৃত্যুভাবনাকে তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের সূচনালগ্ন থেকে একেবারে 'শেষলেখা' (১৯৪১) পর্যন্ত কাব্যের বিভিন্ন কবিতাকে তিনি গ্রহণ করেছেন এবং আলোচনার অনুষঙ্গে তিনি সমকালীন স্বদেশ ও বিশ্বের প্রেক্ষাপটকে তুলে ধরেছেন। সেদিক থেকে প্রবন্ধগুলি হয়েছে রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টির বিবর্তনের কালিক অভিঘাতের অনন্য প্রতিশ্রুতি।

২

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু ছিল ঠাকুর পরিবার, যার ধর্ম-কর্ম, ত্যাগ-ভোগ, কলায়-বিদ্যায়, স্বজাত্যে ও বিশ্বমানসিকতায় আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, সেখানেই অতিক্রান্ত হয়েছে তাঁর বাল্য ও কৈশোরের শিক্ষা। এটি হল রবীন্দ্র-জীবন গঠনের এক অনন্য সোপান। ফলে রবীন্দ্রনাথের মানসলোক এক আনন্দলোকে, মঙ্গলালোকে, সত্য ও সুন্দরের সুসামঞ্জস্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হল। তিনি হয়ে উঠলেন উপনিষদের স্তনপানপুষ্ট সন্তান। তাঁর বিশ্বাসের মৃত্যুচেতনা

মুক্তি ও অমরত্বের ধারনায় প্রতিষ্ঠিত হল। তিনি আত্মার পূর্ণস্বরূপকে অসীমের বৃহত্তর জায়গায় প্রসাকিত করে দেখলেন। ব্যক্তিকে নিজের ক্ষুদ্রসীমায় খণ্ড করে না দেখে পূর্ণ স্বরূপের সীমাহীনতায় প্রসারিত করে দেখতে পারলে মৃত্যু নিয়ে আর ভয়ের প্রশ্ন আসে না। এই পূর্ণস্বরূপ, সেখানে আত্মার সকল কলুষতা এবং সংসারের সকল যাতনা নিমেষের মধ্যে হয়ে যায় একাকার। কাজেই জীবনের অন্তরে সেই পূর্ণস্বরূপের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হলেই লাভ করা যায় অমৃতত্ব। আর তখনই মনের কাছে মৃত্যু ভীতিপ্রদ হয়ে ওঠেনা। আসলে এ হল রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু সম্পর্কে এক অনন্য দর্শন। তাঁর কাছে মনে হয়েছে মৃত্যুজীবনের পূর্ণচ্ছেদ নয়, নবজীবনের প্রবেশদ্বার।

৩

১৮৭৫ সাল। ১০ মার্চ রীন্দ্রনাথের বয়স তখন চোদ্দ, এই বাল্য বয়সে তিনি হারালেন মা সারদা দেবীকে। আবার একদশক অতিক্রান্ত হতে না হতেই তেইশ বছর বয়সে ১৮৮৪ সালের ১৯ এপ্রিল (৮ বৈশাখ, ১২৯১) তাঁর দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী, কাদম্বরী দেবী, যিনি রবীন্দ্রনাথের পরম ভালোবাসার ধন, লোকান্তরিত হলেন। বউঠাকরুণের এই মৃত্যু রবীন্দ্রজীবনকে শোকাহত করলেও বিনষ্টির দিকে নিয়ে যায় নি, এই করুণ বেদানা বিহ্বল অভিজ্ঞতাকে তিনি জীবন তথা কাব্যের ক্ষেত্রে অপচায়িত হতে দেন নি। যার ফলে আমরা তাঁর 'ভানুসিংহের পদাবলী' (১৮৮৪) গ্রন্থের বিখ্যাত কবিতা 'মরণ' পেলাম,

> "মরণ রে,
> তুঁহুঁ মম শ্যামসমান।
> মেঘবরণ তুঝ, মেঘজটাজুট
> রক্তকমল অধর, রক্ত অধরপুট।"[২]

কিংবা ১৮৮৬ সালে রচিত 'প্রভাতসঙ্গীত' এর বিখ্যাত কবিতা, 'প্রাণ'-এ বলতে শুনি,

> "মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
> মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
> এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
> জীবন্ত হৃদয়-মাঝে যদি স্থান পাই।"[৩]

সময়ের সাথে সাথে রবীন্দ্রনাথ সঞ্চয় করেছেন জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা। পর্যবেক্ষণের গভীরতা ও জীবনদৃষ্টি তাঁকে মৃত্যু-সম্পর্কে অনন্য প্রত্যয়ী করে তুলেছে। তিনি যেন মৃত্যুর মাঝখানে এক সুখকর ও মনোহারী স্বরূপকে খুঁজে পেলেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে 'মৃত্যু স্বপ্ন' কবিতাটির প্রাবন্ধিক তুলে ধরেছেন, সেই সঙ্গে বলেছেন:

> "তিনি যেন এক রাজহংসের পৃষ্ঠারূঢ় হয়ে উড়ে চলেছেন। তার নিস্পন্দ আঁখিপাতে মৃত্যু নেমে আসে ঘুম হয়ে।"[৪]

এই প্রবন্ধের দ্বিতীয় শিরোনাম 'মৃত্যুর রূপ'। আলোচনার প্রথমেই প্রাবন্ধিক সমষ্টিগত মৃত্যুচিন্তার প্রসঙ্গ রবীন্দ্র-কাব্যজগতের 'মানসী' কাব্যের 'সিন্ধুতরঙ্গ' কবিতাকে হাজির করেছেন। পুরী তীর্থে তরণীর নিমজ্জন উপলক্ষ্যে কিছু যাত্রীর মৃত্যু ঘটনাকে অবলম্বন করে এই কবিতাটি রচিত। ১২৯৪ সালের আষাঢ় মাসে আটশত যাত্রীবাহী জাহাজ

'স্যার জন লরেন্স্' পুরীর রথাযাত্রা শেষে ফিরতিপথে সামুদ্রিক দুর্বিপাকের কবলে পড়ে যাত্রী সহ জাহাজডুবী হয়। এই ঘটনা কবিকে ব্যথিত করেছিল। তারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ জন্মলাভ করে 'সিন্ধুতরঙ্গ' কবিতাটি। 'ভারতী' পত্রিকার ১২৯৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। 'মগ্নতরী' ছিল তখন কবিতার নাম। পরবর্তীকালে নাম পরিবর্তন করে কবি নাম রাখেন 'সিন্ধুতরঙ্গ'।

কবিতার প্রথম স্তবকেই রয়েছে সামুদ্রিক ঝড়ের বর্ণনা। সামুদ্রিক ঝড়ের তাণ্ডবে উত্তাল সমুদ্রের প্রলয়কালীন রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন কবি। ঝড়ের বেগের সঙ্গে সমুদ্রের উন্মত্তরঙ্গ যেন আকাশ স্পর্শ করতে চায়। কবি বলেছেন এ যেন আকাশ-সমুদ্রের মিলন। নিবিড় ঘন অন্ধকারে চারিদিকে তমশাচ্ছন্ন, এর মাঝে শুভ্র বিদ্যুৎ চমক যেন জড় প্রকৃতির প্রলয়ংকারী অট্টহাস্য। তবে, তিনি এই কবিতায় জড়ের সর্বধ্বংসী চেতনাসত্তার চিত্র খুব বেশি অঙ্কন করেননি। ক্রমে ঝড়ের দাপটে সামুদ্রিক তরঙ্গ বেড়ে চলেছে— তা দেখে কবি মনে করেছেন:

"যেন রে পৃথিবী ফেলি বাসুকি করিছে কেলি
সহস্রৈক ফণা মেলি আছাড়ি লাঙ্গুল।
যেন রে তরল নিশি টলমল দশ দিশি
উঠিছে নড়িয়া
আপন নিদ্রার জাল ফেলিছে ছিঁড়িয়া।
নাই সুর, নাই ছন্দ, অর্থহীন নিরানন্দ
জড়ের নর্তন।
সহস্র জীবনে বেঁচে ওই কি উঠেছে নেচে
প্রকাণ্ড মরণ?"[৫]

সমুদ্র তরঙ্গ নৌকার কিনারা ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে টেনে ফেলে যেন সকল যাত্রীকে গ্রাস করতে চায়। আর নৌকা না ডোবার পণ করায় তরঙ্গ তাই আঘাত হেনে চলেছে শতসহস্রবার। এই ভয়ংকর পরিস্থিতিতে যাত্রীরা স্মরণাপন্ন হয়েছে কল্যাণময় ঈশ্বরের নিকট। কিন্তু তাদের সকল আবেদন নস্যাৎ করে বিমাতা সমুদ্রের হিংস্র উতরোল। চারপাশে কেবল দেখা যায় 'সহস্র করাল মুখ সহস্র আকার।' নৌকার তলদেশ ছিদ্র হয়, জল ঢুকতে থাকে হু হু করে। নিমেষেই ফুরিয়ে যায় জড়ের আঘাতে জীবনের উল্লাস।

এই কবি কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন জড়ের হিংস্রতার মধ্যে মানবী মায়ের সন্তানের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসাকে। একদিকে হিংস্র বিমাতা সমুদ্রের নির্দয়তা, অন্যদিকে দয়াময়ী মাতার হৃদয়ছেঁড়া আর্তক্রন্দন। একজন চায় সন্তানকে মৃত্যু দিতে, অন্যজন চায় বুকের রক্ত জল করে প্রাণাধিক প্রাণ সন্তানকে রক্ষা করতে। সন্তানের জন্য সদা উদ্বেগ ব্যাকুল মাতার হৃদয়ার্তি ব্যক্ত করেছেন কবি এভাবে— 'দীপশিখা-মন কাঁপে ভীত ভালোবাসা।' বিস্মিত হয়ে কবি কবিতার শেষাংশে বলেছেন:

"কে বা সত্য, কে বা মিছে, নিশিদিন আকুলিছে,
কভু ঊর্ধ্বে কভু নিচে টানিছে হৃদয়।

জড় দৈত্য শক্তি হানে, মিনতি নাহিকো মানে—
প্রেম এসে কোলে টানে, দূর করে ভয়।”[৬]

ফলে, এই মৃত্যুভাবনা রবীন্দ্রনাথের জীবসত্যের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে গেছে। আবার ‘সোনার তরীর’ (১৮৯৪) ‘প্রতীক্ষা’ কবিতায় দেখি, কবির কাছে মৃত্যু হয়েছে ঐশ্বর্যশালী, গভীর ও সুরভিত। কবি যেন মৃত্যুকে আলিঙ্গনে জড়াতে চান, কিন্তু এই জগৎ ও জীবনে ক্লান্তি অনুভব না করা অবধি তিনি আরও কয়েক বৎসর সময় ভিক্ষা করেন। কবিকে বলতে শুনি:

“ওরে মৃত্যু, জানি তুই আমার বক্ষের মাঝে
বেঁধেছিস বাসা।
যেখানে নির্জন কুঞ্জে ফুটে আছে যত মোর
স্নেহ-ভালোবাসা,
গোপন মনের আশা, জীবনের দুঃখ-সুখ,
মর্মের বেদনা,
চির-দিবসের যত হাসি-অশ্রু-চিহ্ন-আঁকা
বাসনা-সাধনা;
যেখানে নন্দন-ছায়ে নিঃশঙ্কে করিছে খেলা
অন্তরের ধন,
স্নেহের পুত্তলিগুলি, আজন্মের স্নেহস্মৃতি,
আনন্দ-কিরণ;
কত আলো, কত ছায়া, কত ক্ষুদ্র বিহঙ্গের
গীতিময়ী ভাষা—
ওরে মৃত্যু, জানিয়াছি, তারি মাঝখানে এসে
বেঁধেছিস বাসা!”[৭]

কিংবা,

“ওগো মৃত্যু, ওগো প্রিয়, তবু থাক্ কিছুকাল
ভুবনমাঝারে।
এরি মাঝে বধূবেশে অনন্তবাসর-দেশে
লইয়ো না তারে।
এখনো সকল গান করে নি সে সমাপন
সন্ধ্যায় প্রভাতে;

নিজের বক্ষের তাপের মধুর উত্তপ্ত নীড়ে
সুপ্ত আছে রাতে;
পান্থপাখিদের সাথে এখনো যে যেতে হবে
নব নব দেশে,
সিন্ধুতীরে, কুঞ্জবনে নব নব বসন্তের
আনন্দ-উদ্দেশে।
ওগো, মৃত্যু, কেন তুই এখনি তাহার নীড়ে
বসেছিস এসে?
তার সব ভালবাসা আঁধার করিতে চাস
তুই ভালোবেসে?
এ যদি সত্যই হয় মৃত্তিকার পৃথ্বী' পরে
মুহূর্তের খেলা-
এই-সব মুখোমুখি এই-সব দেখাশোনা
ক্ষণিকের মেলা,
প্রানপণ ভালোবাসা সেও যদি হয় শুধু
মিথ্যার বন্ধন,
পরশে খসিয়া পড়ে, তার পরে দণ্ড-দুই
অরণ্যে ক্রন্দন—
তুমি শুধু চিরস্থায়ী, তুমি শুধু সীমাশূন্য
মহাপরিণাম,
যত আশা যত প্রেম তোমার তিমিরে লাভে
অনন্ত বিশ্রাম—
তবে মৃত্যু, দূরে যাও, এখনি দিয়ো না ভেঙে
এ খেলার পুরী;
ক্ষণেক বিলম্ব করো, আমার দু-দিন হতে
করিয়ো না চুরি।"[৮]

কবি যেন এখানে রচনা করলেন এক ক্লান্ত পথিকের রূপকল্প, তাই তো দেখি কবিতার অন্তিমে আঘাত জর্জরিত আত্মার যন্ত্রণা উপশমের প্রলেপ:

"একে একে চলে যাবে আপন আলয়ে সবে
সখাতে সখীতে,
তৈলহীন দীপশিখা নিবিয়া আসিবে ক্রমে
অর্ধজনীতে,
উচ্ছ্বসিত সমীরণ আনিবে সুগন্ধ বহি
অদৃশ্য ফুলের,
অন্ধকার পূণ করি আসিবে তরঙ্গধ্বনি
অজ্ঞাত কূলের—
ওগো মৃত্যু, সেই লগ্নে নির্জন শয়নপ্রান্তে
এসো বরবেশে।
আমার পরাণবধু, ক্লান্ত হস্ত প্রসারিয়া
বহু ভালোবেসে
ধরিবে তোমার বাহু; তখন তাহারে তুমি
মন্ত্র পড়ি নিয়ো,
রক্তিম অধর তার নিবিড় চুম্বন দানে
পাণ্ডু করি দিয়ো।"৯

'সোনার তরী' (১৮৯৪) কাব্যের মৃত্যু, সেখানে এক পরিপূর্ণতার চিত্রকল্পে অঙ্কিত, যেখানে মৃত্যু দিয়েছে জীবনের পূর্ণতা। মানবজীবন সতত সুখ-দুঃখের আবর্তে আবর্তিত। সংসারে যে একা, সে জন্মায়, নানান কর্মে জীবন বাহিত করে ক্ষণিকের অতিথি হয়ে মৃত্যুকে বরণ করে। জীবনের অন্তিমে করে প্রাপ্তির হিসেবনিকেশ। যা কার্যত নিষ্ফল। কেননা, মৃত্যুর পরপারে এগুলো সঙ্গী হয় না। সেখানে মৃত্যুতেই সমাপ্তি। কাজে মৃত্যু নিয়ে ভীত বা ভাবিত হওয়া নিষ্প্রয়োজন। এই কাব্যের 'ঝুলন' কবিতায় শোনা যায় এক অন্যরকম সুর, যেখানে কবিসত্তা ও জীবন একই দোলায় দোদুল্যমান। এখানে তিনি বুঝেছেন মৃত্যু যেন জীবনকে কোনো এক ভাবনায় উদ্বোধিত করে, এই ভাবনা কবির ঔপনিষদিক চিন্তার সঙ্গে অনেকটা যুক্ত হয়ে গেছে। মৃত্যুর চরম ধাক্কা একদিন তাঁর চিত্তের অসাড়তাকে দূর করবে। প্রবল ঝঞ্ঝা তথা কঠিনতম আঘাত জাগরণ ঘটায় আত্মার। এ প্রসঙ্গে স্মরণ কার যায় শেলির 'ode to the west wind' কবিতার বিখ্যাত লাইন,

"Be thou sprit fierce
My Sprit! Be thou me, inpetuous one!"

কবির 'ঝুলন' কবিতায় মৃত্যুর প্রসঙ্গ এসেছে বারে বারে:

"আমি পরানের সাথে খেলিব আজিকে মরণখেলা।"[১০]

আর একটি পংক্তি:

''মরণদোলায় ধরি রশিগাছি''[১১]

উক্ত পংক্তিদ্বয়ে উল্লিখিত দুটি শব্দ 'মরণখেলা' ও 'মরণদোলা'র মধ্যে রয়েছে মৃত্যুর পূর্ণ ইঙ্গিত। তবে লক্ষ করার বিষয় 'মরণখেলা'-মধ্যে যে ইঙ্গিত ব্যক্ত হয়েছে তা হল, অসাড়, অলস মনকে প্রবল ধাক্কার জোরে জাগাতে হয়, এই ধাক্কা দেওয়ার কাজ করে দোলা- আর এই ঝুলন সেই দোলারই পৌরাণিক বিধিভঙ্গের জাগরণী উন্মাদনা।

এরপর প্রাবন্ধিক 'চিত্রা' (১৮৯৬) কাব্যের 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাতে মৃত্যুকে দেখেছেন নতুন ভঙ্গি ও নতুন মেজাজে। এখানে কবি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন দেশপ্রেমিকের প্রতি, যাদের মৃত্যু হয়েছে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত, অথচ অন্যের মঙ্গলার্থে। 'মৃত্যুর পরে' কবিতায় কবি বিষয়বস্তু হিসেবে বেছে নিয়েছেন ব্যক্তির মৃত্যুকে। এই ব্যক্তির মৃত্যুর অন্তরালে আছে কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া, তাঁর আত্মার শান্তি কামনায় আত্মিক প্রার্থনা। ব্যক্তির মৃত্যু চূড়ান্ত হলেও লোকান্তরিত আত্মার কাছে তা এক আনন্দদায়ক পরিসমাপ্তি হতে পারে, কিন্তু তা জীবন্ত মানুষের মনে এক বেদনাদায়ক শূন্যতা রেখে যায়। এই ধরনের মৃত্যু কোনো পরিপূর্ণতা নয়, তাইতো কবি অন্ধের মতো অর্থের সন্ধানে ফিরে বেড়ান আর লেখেন:

'হেথায় যে অসম্পূর্ণ সহস্র আঘাতে চূর্ণ
বিদীর্ণ বিকৃত
কোথাও কি একবার সম্পূর্ণতা আছে তার
জীবিত কি মৃত,''[১২]

'সোনার তরী' ও 'চিত্রা'-র পরবর্তী কাব্য 'চৈতালি' (১৩০২ চৈত্র থেকে ১৩০৩ শ্রাবণ)-র মৃত্যু বিষয়ক কবিতাগুলোতে প্রস্ফুটিত হয়েছে মৃত্যুকেন্দ্রিক একই রহস্যবোধ। এখানে বিশ্বসৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ধুলি মাটির জগতে প্রত্যাবর্তন করে পরিগ্রহ করেছেন আপন মূর্তি। এর মৃত্যুবিষয়ক কবিতাকে ঘিরেও মানজীবনের অন্তিম পরিণতি সম্পর্কে 'কি', 'কেন' প্রশ্ন জাগরিত হয়, যা বিশ্বজগৎকে বিদ্রূপ করে। তা, যে বিশ্বমাতাকে 'মা' বলে ভক্তি করেন, তাকেই 'পিশাচী' বলে তিরস্কার করেছেন। 'ভয়ের দুরাশা' কবিতায় বলেন,

''মা বলিয়া ভুলাইব তোমারে, পিশাচী।''[১৩]

আবারও কতকগুলি কবিতায় লক্ষ্য করা যায় পৃথিবীর গভীর ভালোবাসা ও সাধারণ মানুষের মধ্যে মহত্তর ভাবনার বিকাশ। এ ধরনের কবিতাগুলি হল, 'দেবতার বিদায়', 'পুণ্যের হিসাব', 'দুর্লভজন্ম' প্রভৃতি। এর মধ্যে 'দেবতার বিদায়' কবিতায় বিবেকানন্দের জীবসেবাই শিব সেবা এই ধারণার পূর্বাভাস দিয়েছেন। ভক্ত সাধককে দীনবেশে ছলনা করে দেবতা শিক্ষা দিয়েছেন।

''জগতের দরিদ্ররূপে ফিরি দয়া তরে
গৃহহীন গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে।''[১৪]

এই কাব্যে মৃত্যু ও জীবনকে বিভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছেন কবি। তাই কতকগুলো কবিতায় দেখি মৃত্যুর ভয়ংকর রূপকে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা। আসলে রবীন্দ্রনাথ হলেন মহান মানবিক পুরুষ, যাঁর কাছে মৃত্যু তুচ্ছতমবিষয়। কেননা, বারে বারে মৃত্যুর ধাক্কা তিনি সম্মুখ থেকে জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছেন। তাই, মৃত্যুর ভয় তাঁকে দুর্বল করতে পারে নি, বরং তার থেকে সঞ্চয় করেছেন নিজেকে ভালো রাখারও আপন কর্তব্যকর্মে দৃঢ় থাকার শক্তি। ফলে, কনও কখনও মৃত্যুকে দেখেছেন সদ্যবিবাহিত পুরুষ হিসেবে, যার মধ্যে তখনও নবপরিণীতা বধূর নম্র, লাজুক আহ্বানের ভয় বিরাজমান। যে ভয় তাকে সংকুচিত করে রেখেছে।আর এই ভয়কে যখন সে জয় করে নেয়, তখন তার কাছে নববধূ নতুন আঙ্গিকে ধরা দেয়। মৃত্যুর ও অনুরূপ রূপ, যার প্রথম আহ্বানে জগৎ সন্ত্রস্ত, কিন্তু যে এই ভীতি জয় করতে সক্ষ হয়েছে, সে মহাজাগতিক সংকল্পনার অঙ্গ হয়ে গেছে।

'কল্পনা' (১৩০৭ বঙ্গাব্দ) কাব্যে মৃত্যুর যে সুর ধ্বনিত হয়েছে তা এক ভিন্ন অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ। এখানে মৃত্যু হয়েছে তাঁর প্রতিবেশী বন্ধু, যা তাঁকে ভারাক্রান্ত করে না। তাই, 'হতভাগ্যের গান' কবিতার অন্তিম পংক্তিতে তাঁকে বলতে শুনি:

''মৃত্যু যেদিন বলবে 'জাগো', প্রভাত হল তোমার রাতি'
নিবিয়ে যাব আমার ঘরের চন্দ্র সূর্য দুটো বাতি।
আমরা দোঁহে ঘেঁষাঘেঁষি চিরদিনের প্রতিবেশী,
বন্ধুভাবে কণ্ঠে সে মোর জড়িয়ে দেবে বাহুপাশ-
বিদায়কালে অদৃষ্টেরে করে যাব পরিহাস।।"[১৫]

মৃত্যুকে এরূপ উপহাসের কারণ বাস্তজীবন বোধ ও মৃত্যুসম্পর্কে উপলব্ধির নয়া মোড়। সেই সঙ্গে মৃত্যুর আবির্ভাবের কারণও তিনি আবিস্কার করে ফেলেছেন। তাঁর মতে মূল্যহীন অবাঞ্ছিতের জন্য সঞ্চিত লজ্জা, অপমানের অবসান ঘটাতে আবির্ভূত হতে পারে মৃত্যু দূত। মৃত্যু সম্পর্কিত এরূপ ধারণা দূর করে মৃত্যুভীতি এবং পরিশুদ্ধ করে অন্তরাত্মা।

পরবর্তী কাব্য 'নৈবেদ্য' (১৩০৮ বঙ্গাব্দ), উৎসর্গ করেন পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্দেশ্যে। যিনি ছিলেন ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর পিতা পাঠ নিয়েছিলেন বেদান্ত ও উপনিষদ নিখুঁতভাবে, আর উপলব্ধি করেছিলেন বিশ্বজগতের করুণাময়ের নির্মল উপস্থিতিকে। তাই তাঁকে এই কাব্য উৎসর্গ দ্বারা বুঝিয়ে দিয়েছেন— এই কাব্যের মূল বক্তব্য আধ্যাত্মিক ভাবনা নির্ভর। তবে মানুষ সেখানে অবহেলিত বা বঞ্চিত নয়। কেননা, ক্ষমা, দয়া, ত্যাগ ও পবিত্রতার দ্বারা মানুষ মহান এবং দেবতা সদৃশ হয়। এই কাব্যে তাই তিনি থেকেছেন ঈশ্বরের দৃঢ় বিশ্বসী ও আস্থাশীল। ২০ নং কবিতায় তিনি বলেছেন:

''তোমার সেবায় মহৎ প্রয়াস
সহিবারে দাও ভকতি।
...জীবনে মরণ করিয়া বহন
প্রাণ পাই যেন মরণে।"[১৬]

রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী বিয়োগের (১৩০৯ বঙ্গাব্দের ৭ অগ্রহায়ণ) কে বছর পর বেদনাভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে রচনা করেন ক্ষীণকায় কাব্য 'স্মরণ' (১৮৯৩)। কাব্যটিতে রয়েছে ব্যক্তিগত শোকানুভূতি, শোকাচ্ছন্ন মনের উপলব্ধি, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পত্নীকে নতুনরূপে অনুভবের চেষ্টা এবং শেষে ঈশ্বরের পায়ে আত্মসমর্পণের দ্বারা শান্তি লাভের প্রয়াস। পত্নীর প্রায়াণের পর মৃত্যুকে তিনি করেছেন 'প্রিয়তম'। তাঁর মৃত্যু দ্বারা যেন কবি জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে রচনা করেছেন সংযোগসেতু :

''জন্ম-মরণের মাঝখনে
নিস্তব্ধ রয়েছে দাঁড়াইয়া।
তুমি মো জীবন মরণ
বাঁধিয়াছ দুই বাহু দিয়া।"[১৭] ১৩ নং কবিতা

মৃতুর একটি মাত্র অনন্য রূপ প্রতিফলিত হয়েছে 'শিশু' (১৯০৩) কাব্যগ্রন্থে। এই কাব্যের অধিকাংশ কবিতা রচনা করেছিলেন আলমোড়ায় বাসকালে (১৩১০ শ্রাবণ-ভাদ্র)। কবি অসুস্থ কন্যা রেণুকাকে সুস্থ করার জন্য তখন শৈলাবাস করেছেন সেখানে। যার মাত্র এক বৎসর পূর্বে সহধর্মিণী মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু ঘটেছে। তাই স্বজন হারানোর ঘা তখনও দগ্‌দগে। এর মধ্যে কন্যার অসুস্থতাও মৃত্যুতে ব্যথিত হয়েছেন তিনি। মাতৃ-বিয়োগের অব্যবহিত পরে সন্তানদের মৃত্যু, একে একে মৃত্যুঝড় যেন তাঁর মনন উপত্যকাকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল। নিষ্পাপ শিশু, যে জানে না মরণের সংজ্ঞা, অথচ তার সন্নিকটেই ছিল আসন্ন মৃত্যু। এরূপ নির্দয় মৃত্যুর ক্রমিক আঘাতে ক্ষতবিক্ষত কবিমন উপনীত হয়েছিল বাস্তব উপলব্ধির আঙিনায়। তাই, এই কাব্যে তিনি শিসুদের মনজগতে প্রবেশ করে তাদের বাস্তব অনুভূতিগুলির রূপায়ণ ঘটিয়েছেন:

''পড়ার কথা আজ বোলো না।
যখন বাবার মতো

বড়ো হব তখন আমি
পড়ব প্রথম পাঠ—
আজ বলো মা, কোথায় আছে
তেপান্তরের মাঠ।”১৮

১৩২১ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ প্রকাশিত আর এক কাব্যগ্রন্থ হল ‘উৎসর্গ’। এই কাব্যের মৃত্যু বিষয়ক কবিতাগুলোতে প্রকাশ পেয়েছে মরণ-অভিজ্ঞতার ভিন্ন ভিন্ন উপলব্ধির বহিঃপ্রকাশ। যেমন, ‘মরণ’ কবিতায় দেখি মৃত্যুকে উপেক্ষা না করে মানিয়ে নেওয়ার আত্মিক প্রচেষ্টা। মৃত্যু এখানে ধরা পড়েছে কখনও শিব, কখনও প্রেমিক রূপে। কবি কবিতায় মৃত্যুকে মারমুখী হিংস্র অভিযান প্রত্যাহার করে বিজয়ীর ভূমিকায় আবির্ভাবের আহ্বান জানিয়েছেন। কেননা, মৃত্যু তাঁর কাছে জোরজবরদস্তিমূলক থেমে যাওয়া নয়, বরং রাজকীয় অবসান। তাই, ‘মরণমিলন’ কবিতায় বলতে চেয়েছেন জীবনকে উপলব্ধি করতে হলে মৃত্যু দিয়েই তা সম্ভব। তাই, পথে বেরিয়ে সংকটজনক পরিস্থিতির স্বীকার হলে পিছিয়ে না গিয়ে মুখোমুখি দাঁড়াতে বলেছেন:

‘‘আমি ফিরিব না করি মিছা ভয়—
আমি করিব নীরবে তরণ
সেই মহাবরষর রাঙা জল
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।”[১৯]

আবার, ‘জন্ম ও মরণ’ কবিতায় বলেছেন:

‘‘কে চাহে সংকীর্ণ অন্ধ অমরতাকূপে
এক ধরাতল-মাঝে শুধু এক রূপে
বাঁচিয়া থাকিতে! নব নব মৃত্যুপথে
তোমারে পূজিতে যাব জগতে জগতে।।”[২০]

লেখিকার রবীন্দ্র-মৃত্যুবাবনার কাব্যানুক্রমিক আলোচনার পথে পরবর্তী কাব্য ‘গীতাঞ্জলি’ (১৯১০)। কাব্যটি ভগবৎ প্রেমের উল্লেখযোগ্য নিদর্শনস্বরূপ। এর গানগুলোতে ধ্বনিত হয়েছে ভগবানের চরণে আত্মনিবেদনের ব্যাকুল আর্তি। সকল অহংকারকে বিসর্জন দিয়ে পরমকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। লেখিকার মতে পূর্ববর্তী কাব্যের তুলনায় এখানে যেন মৃত্যুকেন্দ্রিক ভাবনার গভীরতা প্রবল। আসলে পরমের সাধনায় মগ্ন কবির অন্তরাত্মায় লালিত প্রেমানুভব পূর্বের তুলনায় হয়েছে শুচিস্নিগ্ধ, এনেছে প্রশান্তি। যা তাঁর ভাবনাকে করেছে আরও গভীর, আরও প্রাঞ্জল। কাব্যের ৭৫ নং কবিতায় ধ্বনিত হয়েছে তারই সুর;

‘‘দয়া দিয়ে হবে গো মোর
জীবন ধুতে।
নইলে কি আর পারব তোমার
চরণ ছুঁতে।”[২১]

আবার, ১২০ নং কবিতায় রয়েছে সীমার মাঝে অসীমকে উপলব্ধি করার আত্মিক প্রয়াস:

‘‘সীমার মাঝে অসীম, তুমি
বাজও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ

তাই এত মধুর।"[২২]

মৃত্যুই যে জীবনের পূর্ণ সমাপ্তি নয়, তা জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন তিনি, আর তার বহিঃপ্রকাশও করেছেন কাব্যকবিতায়। মানুষ জীবনে যেসকল ভালোর দ্বারা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, অন্যের থেকে আপনাকে করেছে স্বতন্ত্র; সেই সমৃদ্ধপূর্ণ জীবনই মৃত্যুর নিকট শ্রেষ্ঠতম অর্ঘ্য। তাই মৃত্যু যেকোনো সময়েই বরণীয়। ১৩৯ নং কবিতায় কবি বলেছেন:

"আছ তুমি এই জানা তো জানি
যার ধরি সেই ভরসার তরী।
খেদ রবে না এখন যদি মরি।"[২৩]

'শেষ লেখা' (১৯৪১) কাব্যটি মৃত্যুকেন্দ্রিক আলোচনার অন্তিমকাব্য। কাব্যটি পুত্র কর্তৃক কবি মৃত্যুর পর প্রকাশিত। মোট পনেরোটি কবিতা রয়েছে কাব্যটিতে। এই কাব্যটি রচিত হয়েছে একেবারে তাঁর জীবনসূর্য অস্তমিত যাওয়ার মুখে। এই কাব্যের কবিতাগুলো একে একে পাঠ করলে দেখা যাবে, তিনি যতই মৃত্যুর দিকে এগিয়ে আসছেন, ততই যেন আরও প্রশান্তি অনুভব করেছেন। কোনো ভয় বা আড়ষ্ঠতা তাঁকে গ্রাস করেনি। তবে, মাঝে মাঝে তিনি স্মরণ করেছেন অতীতকে। জীবনের শেষলগ্নে এসে আরও নতুন কিছু সৃষ্টির জন্য তখনই তিনি রয়েছেন আকাঙ্ক্ষিত।

জীবনের শেষপ্রান্তে তখনও তিনি সত্যকেই অবলম্বন করতে চেয়েছেন, মায়াময় মৃত্যুভীতিকে তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন। জীবনকেন্দ্রিক বাস্তব আঘাত তাঁকে শিখিয়েছিল জগৎ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। তাই, শেষলগ্নে মিথ্যার মোহময়তাকে পরিত্যাগ করে কঠিন সত্যকেই ভালোবাসতে চেয়েছেন:

"সত্য যে কঠিন,
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম,
সে কখনো করে না বঞ্চনা।"[২৪]

এই কাব্যের শেষ কবিতা অর্থাৎ ১৫ নং কবিতাটিও বেশ দ্যোতনাময়। কবি যেন তাঁর জীবনদেবতার ছলনা ধরতে পেরে গেছেন। তাই, শেষবার মুখোমুখি হয়েছেন জীবনদেবতীর। আর, ছলনাময়ীকে নারীকল্পনা করে বলেছেন:

"তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছে আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে,
হে ছলনাময়ী।"[২৫]

এইভাবে প্রাবন্ধিক বিভিন্ন কাব্যের নির্বাচিত কবিতার সূত্রে রবীন্দ্রনাথের মানসলোকে যে মৃত্যুর রূপ দেখা গেছে তার মননিষ্ঠ আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্র-কাব্য অনুশীলনের গভীরতা তাঁর প্রতিটি কাব্যের আলোচনায় লক্ষ্য করা যায়। এই অংশটি হয়েছে তাঁর রবীন্দ্র-কাব্যপ্রীতি তথা রবীন্দ্র-অনুধ্যানের অনন্য অভিব্যক্তি।

তথ্যনির্দেশ:

১. 'প্রবন্ধ সংগ্রহ ৩', সুকুমারী ভট্টাচার্য, গাঙচিল, প্রথম প্রকাশ মে, ২০১৩, পৃ. ১০
২. 'সঞ্চয়িতা', 'মরণ', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ,-১৩৩৮ পৌষ, পৃ. ২৯
৩. 'সঞ্চয়িতা', 'প্রভাতসঙ্গীত কাব্য', 'প্রাণ', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ ১৩৩৮ পৌষ, পৃ. ৪২
৪. 'প্রবন্ধ সংগ্রহ ৩', 'অমৃতের পথে: রবীন্দ্রকাব্যে মৃত্যু-প্রসঙ্গ', সুকুমারী ভট্টাচার্য, গাঙচিল, প্রথম প্রকাশ, মে, ২০১৩, পৃ. ৩১১
৫. 'সঞ্চয়িতা', 'মানসী' কাব্য, 'সিন্ধুতরঙ্গ', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ-, ১৩৩৮ পৌষ, পৃ. ৬১
৬. তদেব, পৃ. ৬৪

৭. 'সোনার তরী', 'প্রতীক্ষা', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ, ১৩০০, পৃ. ৮৪
৮. তদেব, পৃ. ৮৮
৯. তদেব, পৃ. ৯০
১০. 'সঞ্চয়িতা', 'সোনার তরী', 'ঝুলন', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ ১৩৩৮, পৌষ, পৃ. ১৪৭
১১. তদেব, পৃ. ১৪৯
১২. 'সঞ্চয়িতা', চিত্রা', 'মৃত্যুর পরে', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ ১৩৩৮, পৌষ, পৃ. ২২৬
১৩. 'চৈতালি', ভয়ের দুরাশ্য', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ১৩০৩ আশ্বিন, পৃ. ৮০
১৪. 'চৈতালি', 'দেবতার বিদায়' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ ১৩০৩, আশ্বিন, পৃ. ২৪
১৫. 'সঞ্চয়িতা', 'কল্পনা' কাব্য, 'হতভাগ্যের গান' বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ ১৩৩৮, পৌষ, পৃ. ৩১২
১৬. 'সঞ্চয়িতা', 'নৈবেদ্য', '২০ নং কবিতা', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ ১৩৩৮, পৌষ, পৃ. ৩১২
১৭. 'সঞ্চয়িতা', 'স্মরণ' ১৩ নং কবিতা, বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ ১৩৩৮, পৌষ, পৃ. ৪৪৯
১৮. 'সঞ্চয়িতা', 'শিশু', 'ছুটির দিনে', বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ ১৩৩৮, পৌষ, পৃ. ৪৬০
১৯. 'সঞ্চয়িতা', 'উৎসর্গ', 'মরণ মিলন', বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ-১৩৩৮, পৌষ, পৃ. ৪৭৪
২০. 'সঞ্চয়িতা', 'উৎসর্গ', 'জন্ম ও মরণ', বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ-১৩৩৮, পৌষ, পৃ. ৪৭৫
২১. 'সঞ্চয়িতা', 'গীতাঞ্জলি', '৭৫ নং কবিতা', বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ-১৩৩৮, পৌষ, পৃ. ৫০১
২২. 'সঞ্চয়িতা', 'গীতাঞ্জলি', '১২০ নং কবিতা', বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ-১৩৩৮, পৌষ, পৃ. ৫১১
২৩. 'সঞ্চয়িতা', 'গীতাঞ্জলি', '১৩৯ নং কবিতা', বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ-১৩৩৮, পৌষ, পৃ. ৫১৪
২৪. 'সঞ্চয়িতা', 'শেষ লেখা', '১০ নং কবিতা', বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ-১৩৩৮, পৌষ, পৃ. ৮৬৩
২৫. 'সঞ্চয়িতা', 'শেষ লেখা', '১৫ নং কবিতা', বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ-১৩৩৮, পৌষ, পৃ. ৮৬৪

আকর গ্রন্থ:

'প্রবন্ধ সংগ্রহ ১' সুকুমারী ভট্টাচার্য। গাঙ্‌চিল। প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী, ২০১২
'প্রবন্ধ সংগ্রহ ২' সুকুমারী ভট্টাচার্য। গাঙ্‌চিল। প্রথম প্রকাশ আগস্ট, ২০১৪
'প্রবন্ধ সংগ্রহ ৩' সুকুমারী ভট্টাচার্য। গাঙ্‌চিল। প্রথম প্রকাশ মে, ২০১৩
'প্রবন্ধ সংগ্রহ ৪' সুকুমারী ভট্টাচার্য। গাঙ্‌চিল। প্রথম প্রকাশ এপ্রিল, ২০১৪

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১. 'রবীন্দ্র জীবনী', প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী প্রকাশন, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, চতুর্থ সংস্করণ, বৈশাখ, ১৩৭৭
২. 'প্রবন্ধ সমগ্র', চতুর্থ খণ্ড, অন্নদাশঙ্কর রায়, সম্পাদনা ধীমন দাশগুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৪০৪
৩. 'রবীন্দ্র রচনাবলী' নবম খণ্ড, 'জীবন স্মৃতি', ১২৫ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ বিশ্বভারতী সংস্করণ, শ্রাবণ, ১৩৯৬।
৪. 'রবীন্দ্র রচনাবলী', দ্বাদশ খণ্ড, 'মনুষের ধর্ম', পরিশিষ্ট মানবসত্য', পূর্বোক্ত সংস্করণ
৫. 'প্রবন্ধ সংগ্রহ ৩', 'অমৃতের পথে: রবীন্দ্রকাব্যে মৃত্যু-প্রসঙ্গ', সুকুমারী ভট্টাচার্য, গাঙ্‌চিল, প্রথম প্রকাশ, মে, ২০১৩